ইউনিট ৯

ব্যবস্থাপনার প্রকৃতি
(Nature of Management)

ভূমিকা

সমগ্র বিশ্ব জগৎ এর যেদিকেই তাকাইনা কেন সর্বত্রই একটি সুষ্ঠু নিয়মনীতি লক্ষ্য করা যায়। এই যে সূর্যের গতিবিধি, জোয়ার-ভাটা, দিন-রাত, চন্দ্রের আবর্তন, উল্কা, ধূমকেতু, অন্যান্য তারকা-রাজি এই সবকিছুই একটি নিয়ম-কানুনের মধ্যে চলছে। সৃষ্টিকর্তা সবকিছু সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করছেন বলেই বিশ্ব ব্রাহ্মান্ডে এই শৃঙ্খখলার সৃষ্টি হয়েছে। তেমনিভাবে মানুষের কোন কাজই আপনা-আপনি সম্পন্ন হয় না। ব্যক্তি জীবন ছাড়াও পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, সংঘ, স্কুল, কলেজ, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সবকিছুকেই নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন বা শৃঙ্খখলার মধ্যে পরিচালনা করার জন্য যে পদ্ধতির প্রয়োজন হয় সেটাই ব্যবস্থাপনা। তাই বলা যায় যে ব্যবস্থাপনা হচ্ছে কতগুলো দুনির্দিষ্ট কার্যাবলী (Function) সম্পাদন করার মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য অর্জন করার একটি প্রক্রিয়া মাত্র। সভ্যতার প্রাথমিক অবস্থাতেই ব্যবস্থাপনা উৎপত্তি ও বিকাশলাভ করতে থাকে। কালের বিবর্তনের ধারায় বর্তমান সমাজের ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানিক সকল পর্যায়েই ব্যবস্থাপনা একটি অপরিহার্য উপাদান।

পাঠ ১ সংজ্ঞা, পরিধি ও গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- ব্যবস্থাপনার পরিধি সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

সংজ্ঞা

মানব সভ্যতার শুরু হতে ব্যবস্থাপনা বিভিন্ন মানব সংগঠনে বিস্তৃত ছিল। ব্যবস্থাপনা বা Management ইটালীয় শব্দ 'Maneggiare' হতে এসেছে। যার শাব্দিক অর্থ অশ্ব পরিচালনা করা (To handle)। কিন্তু কালের বিবর্তনে ইহা মূলত মানব জাতিকে পরিচালনা অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ব্যবস্থাপনাকে এক কথায় প্রকাশ করা কঠিন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পন্ডিত ব্যক্তি ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেন। নিম্নে কতিপয় সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো-

আধুনিক ব্যবস্থাপনার জনক Henry Fayol এর মতে "ব্যবস্থাপনা হলো পূর্বানুমান ও পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশনা, সমন্বয় সাধন এবং নিয়ন্ত্রণ করা (To manage is to forecast & plan, to organise, to command, to co-ordinate and control).

Terry & Franklin- এর মতে "ব্যবস্থাপনা হলো এমন একটি স্বতন্ত্র প্রক্রিয়া যা মানুষ ও অন্যান্য সম্পদ সমূহের সুষ্ঠু ব্যবহারের লক্ষ্যে উদ্দেশ্য নির্ধারণ ও তা অর্জনের নিমিত্তে পরিকল্পনা, সংগঠন, উদ্বুদ্ধ করন ও নিয়ন্ত্রণ কার্যের সাথে সম্পৃক্ত।"

Harold Koontz-এর মতে, "ব্যবস্থাপনা হচ্ছে এমন একটি পরিবেশ তৈরী করা ও সংরক্ষণ করার প্রক্রিয়া যাতে দলবদ্ধ ব্যক্তিবর্গ দক্ষতার সাথে অভিষ্ট লক্ষে উপনীতি হয়।"

উপরের আলোচনার আলোকে বলা যায় যে, ব্যবস্থাপনা হচ্ছে এমন একটি বিজ্ঞান সম্মত জ্ঞান যা প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ একত্রিকরণ ও এগুলোর পূর্ণ ব্যবহারের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন, সংগঠন, কর্মী সংস্থান, নির্দেশন, প্রেষণা ও নিয়ন্ত্রণমূলক কাজ করতেহয় তাকে ব্যবস্থাপনা বলে।

পরিধি

নিচে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যবস্থাপনার পরিধি বর্ণনা করা হল ঃ

১. ব্যক্তি ও সংগঠনের ভিত্তিতে পরিধি

কোন উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য একদল ঐক্যবদ্ধ লোক থেকে সংগঠনের জন্ম হয়। মুনাফা বা অনুমানাফা ভিত্তিক উভয় সংগঠনের ক্ষেত্রেই ব্যবস্থাপনা পরিব্যপ্ত। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলোঃ

(ক) ব্যক্তি জীবন ঃ যেকোন ব্যক্তি জীবনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সুষ্ঠুভাবে জীবনকে চালাতে বা পরিচালনা করতে হয়। এক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকীয় জ্ঞানের প্রয়োগ অপরিহার্য।

(খ) পারিবারিক জীবন ঃ একটি পরিবারকে বিশেষ করে যৌথ পরিবারে গৃহকর্তা বা কর্তীকে ব্যবস্থাপনার সর্বজনীন কার্যাবলী প্রয়োগ করতে হয়।

(গ) সামাজিক সংগঠন ঃ বিভিন্ন ধরনের কল্যাণমুখী সামাজিক সংগঠন যেমন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, সমিতি, দাতব্য চিকিৎসালয় ইত্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ব্যবস্থাপনার প্রয়োগ করতে হয়।

(ঘ) রাষ্ট্র বা সরকার ঃ যে কোন রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য ব্যবস্থাপনার প্রয়োগ অত্যাবশ্যকীয় বিষয় এজন্য প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট বলেছেন, "ভাল ব্যবস্থাপনা ছাড়া একটা ভাল সরকার বালির উপর তৈরী বাড়ির মত (A good Government without good Management is a house built on sand")

(ঙ) ব্যবসায় সংগঠন ঃ আধুনিক বিশ্বের। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ব্যবসায় সংগঠনিক কার্যের প্রতিটা স্তরেই সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার প্রয়োগ অনস্বীকার্য।

২. কাজের ভিত্তিতে ব্যবস্থাপনার পরিধি

বিখ্যাত ব্যবস্থাপনাবিদ পিটার্ এফ. ড্রাকারের মতে, নিম্নোক্ত তিন ধরনের কাজ ব্যবস্থাপনা সম্পাদন করে।

ক. প্রতিষ্ঠান পরিচালনা

প্রতিষ্ঠান পরিচালনার অর্থ হচ্চে একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা। এর মূল উদ্দেশ্য হবে গ্রহণযোগ্য মূল্যে পণ্য ও সেবা পরিবেশন করা এবং সম্ভাব্য সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করা। এ লক্ষ্যে গৃহীত সকল কার্যই ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত।

খ. ব্যবস্থাপকের ব্যবস্থাপনা

প্রতিষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপকীয় কার্যে নিয়োজিত সকল নির্বাহী বা ব্যবস্থাপকদের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও ভারসাম্য রক্ষা করা ব্যবস্থাপনার কাজ। এজন্য ব্যবস্থাপনা প্রত্যেক নির্বাহীর জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, নেতৃত্ব, নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদানসহ তাদের কার্যের তদারক ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

গ. শ্রমিক কর্মী ব্যবস্থাপনা

প্রত্যেক শ্রমিক-কর্মীকে একজন মানুষ ও একটি সম্পদ এই দুই দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করতে হয়। তাই দেখা যায় যে,

তাদের সাথে উঁচু স্তরের ব্যবস্থাপকগণকে মোট কার্যসময়ের শতকরা ৬০ হতে ৮০ ভাগ সময় আলাপ আলোচনা ও যোগাযোগ সাধনে ব্যয় করতে হয়। এছাড়া কর্মীদের নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, পদোন্নতি, নেতৃত্ব দান, প্রেষণা, কর্মী পরিচালনা, বদলি, বরখাস্ত, ছাঁটাই, অবসর গ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণের মত মৌলিক কার্য ব্যবস্থাপনার আওতাধীন।

৩. কৌশল প্রয়োগের ভিত্তিতে পরিধি

বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বাজার বহুমুখী কার্য সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন ধরনের কৌশল গ্রহণ করতে হয়, যা ব্যবস্থাপনার আওতাধীন। এরূপ কৌশল গ্রহণের জন্য তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ, বিভিন্ন ধরনের পলিসি, বাজেট, উপদেষ্টা নীতি নির্ধারণ, বিভাগীয় করণ, কমিটি গঠন, প্রয়োজন অনুসারে কেন্দ্রীয় করণ ও বিকেন্দ্রীকরণ দায়িত্ব ও কর্তব্য বন্টন নেতৃত্ব ও প্রেষণাদান, পরিদর্শন ইত্যাদি কর্মসূচী গ্রহণ করতে হয়।

৪. কার্যবিভাগের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যবস্থাপনা পরিধি

প্রতিষ্ঠানে সুষ্ঠুভাবে কার্য সম্পাদনের জন্য ব্যবস্থাপনাকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়; যেমন- উৎপাদ ব্যবস্থাপনা, ক্রয়, বিক্রয় ও বিপণন ব্যবস্থাপনা, অর্থ ব্যবস্থাপনা, জন-সংযোগ ও শ্রমিক-কর্মী ব্যবস্থাপনা, অফিস ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রেই ব্যবস্থাপনা পরিব্যপ্ত।

৫. স্তরভেদে ব্যবস্থাপনার পরিধি

সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনাকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করা যায়। এ তিনটি স্তরের ব্যবস্থাপকদের কার্যাবলীর মধ্যে কিছুটা ভিন্নতা থাকলেও এসবই ব্যবস্থাপনার সীমানার মধ্যে গণ্য হয়।

(ক) সর্বোচ্চ স্তর

সাধারণত এ স্তরে পরিচালনা পর্ষদ, কোম্পানীর সভাপতি, সহ-সভাপতি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও মহা ব্যবস্থাপকগণ বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থাপনা কার্য, যেমন- পরিকল্পনা প্রণয়ন, নীতি (পলিসি) নির্ধারণ, কর্মসূচী গ্রহণ, নেতৃত্ব, নির্দেশনা ও উপদেশ প্রদান দায়িত্ব ও কর্তব্য বন্টন, প্রেষণা দান, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কার্য সম্পাদন করে থাকেন।

(খ) মধ্যম স্তর

এ স্তরে বিভিন্ন বিভাগ ও শাখার ব্যবস্থাপকগণ, নির্বাহী এবং অফিসারগণ সর্বোচ্চ স্তর নির্ধারিত যাবতীয় পরিকল্পনা, পলিসি, নীতি ও নির্দেশনার আলোকে নিম্ন স্তরের কর্মীদের সহায়তায় কাজ সম্পাদন করেন।

(গ) নিম্ন স্তর

এ স্তরে ফোরম্যান ও সুপারভাইজারগণ উপরের নির্দেশ অনুযায়ী সরাসরি শ্রমিকদের কাজ তদারকীর সাথে জড়িত থাকেন।

ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব

নিচে ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব বর্ণনা করা হলঃ

১. লক্ষ্য অর্জন ঃ (Achievement of goal)

প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকে। এই উদ্দেশ্যকে ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন কার্যাবলীর সাহায্যে বাস্ত বায়িত করা হয়। সুতরাং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ বা লক্ষ্য অর্জনে ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অপরিসীম।

২. দক্ষতা বৃদ্ধি (Increase of efficiency)

উদ্দেশ্য অর্জনের সংগে সংগে প্রশিক্ষণও সুষ্ঠু পরিচালনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব ভূমিকা পালন করে।

৩. ব্যবসার উপকরণাদির উন্নয়ন (Development of Business Components) ঃ

ব্যবসা-বাণিজ্যে ছয়টি উপকরণ রয়েছে। যথা- মানুষ, কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, অর্থ, পদ্ধতি ও বিপনণ (Man, Material, Machine, Money, Method & Marketing)। দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই এই উপকরণাদি সংগৃহীত, একত্রিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

৪. উৎপাদনের উপকরণাদির সুষ্ঠু ব্যবহার (Proper Utilization of Production factors)

ধরুন একটি প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক কর্মীর সংখ্যা যথেষ্ট, মূলধনেরও সমস্যা নেই, উন্নতমানের যন্ত্রপাতি এবং বিস্তৃত বাজারও রয়েছে। এখন এগুলো সঠিক ভাবে কাজে লাগাবেন না যতক্ষণ না এগুলোর পেছনে দক্ষ ব্যবস্থাপনা ক্রিয়াশীল হবে। তাই

উৎপাদনের উপকরণ সমূহের সঠিক ব্যবহারের জন্য দক্ষ ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন।

৫. মানব ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Human & Economic Development)

ব্যবস্থাপনার সাহায্যে মানুষের প্রচেষ্টা সমন্বিত হয় এবং কাজের উৎসাহ পাওয়া যা। এতে স্বতঃস্ফূর্ত কাজের পরিবেশ সৃষ্টি হয় যা অর্থনীতির অনুকূল পরিবর্তন সাধন হবে।

৬. অপচয়হ্রাস (Reduction of Wastage)

বর্তমানকালে ব্যবস্থাপনার শ্লোগান হল, 'কম খরচে বেশী উৎপাদন।' এজন্যে বর্তমান ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাপক ও শ্রমিকদের কার্যের মান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করে, উৎপাদন শৈল্পিক পরিবেশ নিশ্চিত করে এবং সমস্ত উপকরণ সমূহের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করে কারবার প্রতিষ্ঠানের অপচয়হ্রাস করে।

৭. শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা (Establishment of Discipline)

শৃংখলা যে কোন প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য দেখা যায় যে, ব্যবস্থাপক তাঁর যে প্রতিষ্ঠানের বা এর কোন বিভাগের সকল কর্মী উপকরণের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও ভারসাম্য স্থাপন করেন এবং শৃংখলা প্রতিষ্ঠার দ্বারা এদের প্রত্যেকের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করেন।

৮. সম্পর্ক উন্নয়ন (Development of Relationship)

ব্যবস্থাপনা মালিক ও শ্রমিক অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কিত সকল পক্ষের মধ্যে উত্তম সম্পর্ক সৃষ্টি ও উন্নয়নে সচেষ্ট থাকে। শুধু তাই নয় সঠিক ব্যবস্থাপনা ক্রেতা বা ভোক্তা এবং বিদেশী উদ্যোক্তাদের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৯. নেতৃত্ব প্রদান (Leading)

উত্তম ব্যবস্থাপনা হচ্ছে নেতৃত্বের গভীরতা ও প্রসারতার বহিঃপ্রকাশ। ব্যবস্থাপনা ব্যতীত কোন মতবাদ, দলীয় কার্যাবলী উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক হয় না।

১০. কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি (Creation of Employment Opportunity)

দক্ষ ব্যবস্থাপনা কোন প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ ও নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান গড়তে সহায়তা করে। তাই দেখা যায়, পৃথিবীর যে দেশ শিল্প ক্ষেত্রে যত অগ্রগতি লাভ করেছে, সেদেশেই তত বেশী নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

১১. গবেষণা ও উন্নয়ন (Research & Development)

বিজ্ঞানীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে যে জ্ঞান আবিষ্কার করে দক্ষ ব্যবস্থাপনার কারণেই তাকে বাস্তবে রূপদান ও এর সুফল জনগণের দ্বারে পৌঁছে দেয়া সম্ভব হচ্ছে।

১২. সামাজিক উন্নয়ন (Social Development)

ব্যবস্থাপনা সমাজে একদল দক্ষ লোক সৃষ্টি করে। এভাবে বিভিন্ন শিক্ষা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে পৃষ্ঠপোষতা প্রদানকরে সামাজিক অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

১৩. জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন (Raising the Living Standard)

মানুষের মাথাপিছু আয় ও ভোগের উপর জীবনযত্রার মান নির্ভর করে। এজন্য কর্মসংস্থান, পনোন্নতি, আর্থিক উন্নয়ন, সুলভে পণ্য বন্টন, উৎপাদন বৃদ্ধি, কমমূল্যে উন্নত মানের পণ্য সরবরাহ ও তা সহজ প্রাপ্তির ব্যবস্থা করে ব্যবস্থাপনা মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

পাঠ-সংক্ষেপ

- ব্যবস্থাপনা বা Management শব্দটি ইতালীয় Manggiare শব্দটি হতে এসেছে যার অর্থ পরিচালা করা।
- সাধারণভাবে ব্যবস্থাপনা হলো অপর লোকের প্রচেষ্টার মাধ্যকে কাজ করিয়ে নেওয়া (Getting things done through the effort of other peoples).
- প্রত্যেক শ্রমিক-কর্মীকে একজন মানুষ ও একটি সম্পদ এই দুই দৃষ্টিকোণ থেকে মুল্যায়ন করতে হয়।
- স্তরভেদে ব্যবস্থাপনা তিন ভাগে বিভক্ত- সর্বোচ্চ স্তর, মধ্যম স্তর, ও নিম্নস্তর।

সর্বোচ্চ স্তরের ব্যবস্থাপকগণ পরিকল্পনা প্রণয়ন, নীতি নির্ধারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কার্য সম্পাদন করে থাকেন।

মধ্যম স্তরের ব্যবস্থাপকগণ নিম্ন স্তরের কর্মীদের সহায়তায় কাজ সম্পাদন করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৯.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন-

১. ইংরেজী "Management" শব্দটির উৎপত্তি কোন দেশে?

ক. ইতালী　　খ. ফ্রান্স

গ. জার্মান　　ঘ. আমেরিকা

২. "Management" শব্দটি নিম্নের কোন শব্দটি হতে এসেছে?

ক. manage　　খ. Maneggaire

গ. Menagee　　ঘ. Managre

৩. ব্যবস্থাপনা হচ্ছে একটি পরিবেশ তৈরী করা ও সংরক্ষণ করার প্রক্রিয়া”- উক্তিটি কার?

ক. H. Koonlg　　খ. H. Fagol

গ. F.W. Yaylor　　ঘ. H. L. Ganth.

৪. আধুনিক ব্যবস্থাপনার জনক কে?

ক F.W. Yaylor　　খ H. Fangol

গ. G.R. Yereny　　ঘ. Al-Farabi

৫. স্তরভেদে ব্যবস্থাপনা কয় প্রকার?

ক. ২ প্রকার　　খ. ৩ প্রকার

গ. ৫ প্রকার　　ঘ. ৭ প্রকার।

পাঠ ২ ব্যবস্থাপনার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যবস্থাপনার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

ব্যবস্থাপনার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ। যদিও উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাবে ব্যবস্থাপনার তত্ত্ব (Management Theory) ও বিজ্ঞানের উদ্ভব ঘটে এবং ব্যবস্থাপনা সাহিত্যের সর্বাধিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। তবে সভ্যতার প্রাথমিক অবস্থায়ই ব্যবস্থাপনার উৎপত্তি ঘটে। তাই মানুষ যখন সংবদ্ধ হয়েছে, কাজের জন্য অন্যের সহায়তা গ্রহণ করতে শুরু করেছে, পেশা অবলম্বন করেছে, তখন থেকেই ব্যবস্থাপনার ক্রমবিবর্তন শুরু হয়েছে। এরপর সমাজের বিবর্তন এবং অর্থনৈতিক সমস্যার ক্ষেত্রে জটিলতা বৃদ্ধির ফলে ব্যবস্থাপনার রীতিনীতি ও কলাকৌশলের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটতে থাকে। নিম্নে ব্যবস্থাপনার ক্রমবির্তনের ইতিহাস তুলে ধরা হলঃ

প্রাচীন যুগে ব্যবস্থাপনা (খ্রিস্টের জন্মের পূর্ব পর্যন্ত) (Management in Ancient Period)

প্রাচীন যুগে ব্যবস্থাপনা প্রধানতঃ ব্যক্তি তথা নেতৃত্ব দানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সভ্যতার সূচনাতেই বিভিন্ন দেশের মানুষ ব্যবস্থাপনার উন্নতিতে অবদান রেখেছে। এর মধ্যে মেসোপটোমিয়া, মিসর, চীন, রোম, গ্রীস, বেবিলন, ভারত প্রভৃতি দেশে ব্যবস্থাপনার অগ্রগতির নিদর্শন পাওয়া যায়।

মেসোপটোমিয়ায় ব্যক্তি নেতৃত্ব থেকে ব্যবস্থাপনার সূত্রপাত ঘটে। ইউফ্রেটিস উপত্যকায় বসতি স্থাপনকারী যাযাবরগণ কৃষিকাজ, মৃৎশিল্প ও বস্ত্র শিল্পের জন্য আয়-ব্যয়ের হিসাব তৈরীকরণ, নথি সংরক্ষণ, প্রতিবেদন প্রণয়ন ইত্যাদির প্রচলন করে।

খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০০-৫২৫ অব্দ পর্যন্ত সময়ে নির্মিত মিসরের পিরামিড উন্নত ব্যবস্থাপনার স্বাক্ষর বহন করছে। প্রাচীন মিসরীয় রাজাগণ বিকেন্দ্রীকরণ, শ্রম বিভাগ, রেকর্ড সংরক্ষণ, উপদেষ্টা ব্যবহার ইত্যাদির প্রচলন করে। এ সময়ে হজরত মুসা (আ) তাঁর অনুসারীদের ভেতর থেকে সামর্থ ও যোগ্য ব্যক্তিদের দলপতি নির্বাচন করতেন। দলপতি নির্বাচনের এ রীতি আজও সমানভাবে সমাদৃত।

পাচীন চীনে লাও-জু (Lau-Tzu) নামক এক ধর্মীয় নেতা কর্মী নিয়োগ ও মূল্যায়ন, পদোন্নতি, শাস্তি বিধান ইত্যাদির প্রচলন করেন। খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টাদশ শতাব্দীতেও চীনের রাষ্ট্রীয় কাজে উপদেষ্টা ব্যবহার, শ্রম বিভাগ, পরিকল্পনা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির প্রচলন ছিল।

রোমের ক্যাথলিক গির্জা প্রথম আনুষ্ঠানিক সংগঠনের স্বীকৃতি পায় এবং গীর্জার পোপের নেতৃত্বে কার্য বিশেষায়ন, কার্যভিত্তিক সংগঠন ইত্যাদির প্রচলন ঘটে। এছাড়া প্রাচীন রোমের বিকশিত বস্ত্র শিল্পের সুষ্ঠু পরিচানার জন্য জোট ও কোম্পানী জাতীয় সংগঠন বেড়ে ওঠে।

প্রাচীন গ্রীসে দার্শনিক প্লেটো শ্রম বিভাগ ও বিশেষায়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। দার্শনিক সক্রেটিস তাঁর লেখনী ও বক্তব্যে প্রকাশ করেন যে, ব্যবস্থাপনা একটি সার্বজনীন বিষয় এবং এটি একটি স্বতন্ত্র ও পৃথক কাজ।

১৮০০ খ্রীস্টপূর্ব ব্যাবিলনের রাজা হাম্মুরাবী (Humurabi) রাজ্য পরিচালার জন্য বিশেষ বিধান চালু করেন যা "The code of Hummurabi" নামে খ্যাত ছিল। এই সভ্যতা থেকে আমাদের কাছে যে আইনগুলো এসেছে সেগুলো হলো- ব্যবসায়-বাণিজ্য সংক্রান্ত আইন, বিক্রয়, ঋণ চুক্তি, অংশীদারীত্ব সম্মতি, চুক্তিবদ্ধ নোট ইত্যাদি।

খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ থেকে ২৫০০ অব্দ পর্যন্ত ভারতের সিন্ধু অববাহিকায় শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির ফলে ব্যবস্থাপনার ও উন্নতি ঘটে। হরপ্পা, মহেঞ্জোদাড়ো, বগুড়ার মহাস্থানগড়, রাজশাহীর পাহাড়পুরে, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন দক্ষ ব্যবস্থাপনার পরিচয় বহন করে।

খ্রিস্টপূর্ব ৩২৫ অব্দে রচিত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রাষ্ট্রের রাজনীতি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিভিন্ন দিকের বিশদ আলোচনা

রয়েছে। মন্ত্রীর গুণাবলী, নেতা, নির্বাচন, রাজ্যের প্রশাসনিক কাঠামো ইত্যাদির বিশদ ব্যাখ্যা কৌটিল্যের আলোচনায় স্থান পেয়েছে।

মধ্যযুগের (খ্রিস্টের জন্মের পর হতে শিল্প বিপ্লবের পূর্বকাল) ব্যবস্থাপনা (Management in Middle Stage)

এ যুগের প্রতিষ্ঠানসমূহ সামন্তবাদী কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও এ যুগের মানুষ সাংগঠন ও ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বর্পূ পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করতে শুরু করেছিল। মধ্যযুগে যারা ব্যবস্থাপনা শাস্ত্রের উন্নয়নে অবদান রাখেন তাদের সম্পর্কে নীচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলঃ

আল ফারাবি ঃ ৯০০ খ্রিস্টাব্দে আল ফারাবী লিখিতভাবে রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোকপাত করেন। নেতার গুণাবলীর বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি একজন নেতার প্রচুর বুদ্ধিমত্ত, প্রখর স্মৃতিশক্তি, দৃঢ়তা, ন্যায়পরায়নতা, সত্য নিষ্ঠাবান, মিতব্যায়ী, অধ্যবসায়ী, সম্পদে অনাসক্তি প্রভৃতি গুণ থাকা দরকার বলে মনে করেন।

ইমাম গাজ্জালী ঃ ১১০০ খ্রিস্টাব্দে ইমাম গাজ্জালী "নসিহাত আল মুলক" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি শাসকশ্রেণীর জন্য ন্যায় বিচার, বুদ্ধিমত্তা, ধৈর্য ও সংযম এই চারটি গুণ অপরিহার্য বলে উল্লেখ করেন। অপরদিকে তিনি হিংসা, ঔদ্ধতা, সংকীর্ণতা ও শত্রুতা এই চারটি দোষ পরিত্যাজ্য বলে বর্ণনা করেন।

চতুর্থদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত কারবার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রগতি সাধিত হয়।

লুকা প্যাসিওলি ১৪৯৪ সালে ইতালিতে দ-তরফা হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি (Double Entry System) প্রবর্তন করেন। এটা ব্যবস্থাপনার কার্যাবলীতে যথেষ্ট সহায়ক হয়।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভেনিসে হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থার বেশ উন্নতি সাধিত হয়। এ সময়ে ইতালিতে অংশীদারী ও যৌথ উদ্যোগ কারবারের প্রসার ঘটে।

থমাস মুর ঃ ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে তিনি "ইউটোপিয়া" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি বিশেষায়ন এবং মানব শক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দিন। তিনি মনে করতেন ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের মাধ্যমে অপচয় রোধ করে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা সম্ভব।

শিল্প বিপ্লবের যুগে ব্যবস্থাপনা (১৭৫০-১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ) [Management in the Industrial Revolution period]

এই সুদীর্ঘ শতাধিক বৎসর সময়ে গ্রেট ব্রিটেনে শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হয়। এ সময়ে উৎপাদনের জন্য কায়িক পরিশ্রমের স্থলে অভিনব যন্ত্রপাতির আবির্ভাব ঘটে। পারিবারিক ব্যবস্থা থেকে বড় বড় শিল্প কারখানায় উৎপাদন বেশী পরিমাণে শুরু হয়। এই বিপ্লবের ফলে উৎপাদন ব্যবস্থায় যেমন ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয় তার সাথে তাল মিলিয়ে ব্যবস্থাপনা শাস্ত্রেও যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটে। এ যুগে যারা ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন তাদের সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলঃ

জেম্স স্টুয়ার্ট ঃ ১৭৫৭ সালে স্যার জেম্স স্টুয়ার্ট তাঁর প্রকাশিত একটি গ্রন্থে ক্ষমতার উৎস সম্পর্কে তত্ত্ব প্রদান করেন এবং শিল্পোৎপাদনে যন্ত্র প্রবর্তনের পক্ষে জোরালো বক্তব্য তুলে ধরেন।

এ্যাডাম স্মিথ ঃ এ্যাডাম স্মিথকে অর্থনীতির জনক বলা হয়। তিনি ১৭৭৬ সালে তাঁর লিখিত The wealth of Nations গ্রন্থে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য শ্রমবিভাগের উপর গুরুত্বারোপ করেন। এখানে তিনি শ্রমবিভাগের পক্ষে নিম্নোক্ত তিনটি মৌলিক সুবিধার কথা উল্লেখ করেন।

১. শ্রম বিভাজন শ্রমিকদের দক্ষতা বাড়ায়।

২. এটা শ্রমিকদের সময় বাঁচায়।

৩. নতুন নতুন যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনে এটা শ্রমিকদের সৃজনী প্রতিভার বিকাশ সাধন করে।

সুতরাং ব্যবস্থাপনার উৎপাদন সংক্রান্ত বিষয়ে এ মনীষীর অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বোল্টন ও জেম্স ওয়াট ঃ এই দুই বিজ্ঞানী তাদের উদ্ভাবনী কার্যের পাশাপাশি ব্যবস্থাপনার যেসব ক্ষেত্রে অবদান রাখেন তন্মধ্যে বাজার গবেষণা ও পূর্বানুমান, কার্য প্রবাহ ও প্রয়োজনের নিরিখে পরিকল্পিত যন্ত্রপাতি বিন্যাস, উৎপাদন পরিকল্পনা, উৎপাদন প্রক্রিয়ার আদর্শমান নির্ণয় ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

রবার্ট ওয়েন ঃ তিনি ১৮০০ হতে ১৮২৮ সাল পর্যন্ত স্কটল্যান্ডের বিভিন্ন বস্ত্রশিল্পে ব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে এক গবেষণা চালান যা তখনকার দিনে অভূতপূর্ব বলে খ্যাত ছিল।

শিল্প বিপ্লবের সে যুগে শ্রমিকদেরকে যখন যন্ত্রের মত মনে করা হত সে সময়ে ওয়েন তাঁর কারখানায় কার্য পরিবেশের উন্নয়ন সাধন করেন। কারখানায় কর্মরত বালক-বালিকাদের জন্য সর্বনিম্ন কার্য বয়ঃসীমা বৃদ্ধি করেন, কর্মচারীদের জন্য কার্য ঘন্টা হ্রাস করেন, কারখানায় শ্রমিকদের আহার পরিবেশনের ব্যবস্থা করেন, কর্মচারীদের জন্য উৎপাদন খরচায় দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহের লক্ষ্যে স্টোরের ব্যবস্থা করেন এবং কর্মচারীদের জন্য বাসস্থান ও রাস্তাঘাট নির্মাণ করে কারখানা জীবনকে আকর্ষণীয় করতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাঁর এ গৌরবোজ্জল ভূমিকার জন্য তাকে "আধুনিক শ্রমিক-কর্মী ব্যবস্থাপনার জনক" নামে অভিহিত করা হয়।

চার্লস ব্যাবেজ ঃ ব্রিটিশ গণিতশাস্ত্র বিদ অধ্যাপক চার্লস ব্যাবেজ উৎপাদন ক্ষেত্রে শ্রম বিভাজনের গুরুত্ব স্বীকার করেন। তিনি অ্যাডাম স্মীথ কর্তৃক উল্লেখিত শ্রম বিভাজনের সুবিধাসমূহের সাথে পারিশ্রমিক নির্ধারণের ভিত্তি হিসেবে সীমাবদ্ধ দক্ষতা নীতিও যোগ করেন।

তিনি শ্রমিকদের জন্য মুনাফা বন্টন প্রথার সুপারিশ করেন। উল্লেখ্য যে, উৎপাদন প্রকৌশল, প্রণোদনামূলক মজুরী ইত্যাদির উপর ব্যাবেজের অবদান অনস্বীকার্য।

আধুনিক যুগে ব্যবস্থাপনা (১৮৭০ সালের পর থেকে বর্তমান সময় পযন্ত) [Manament in the Modern age]

মূলত শিল্প বিপ্লবের যুগ শেষেই আধুনিক ব্যবস্থাপনার উৎপত্তি হয়। এ সময়ে ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে সুশৃংখল ও ধারাবাহিক পদ্ধতি, রীতি-নীতি ও জ্ঞানের উন্মেষ ঘটে।

আধুনিক যুগেই সবচেয়ে বেশী সংখ্যক মনীষী তাঁদের মূল্যবান চিন্তাধারা ও তত্ত্ব দিয়ে ব্যবস্থাপনা শাস্ত্রকে গুরুত্বপূর্ণ ও সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। নিম্নে প্রধান প্রধান মনীষী সম্পর্কে আলোচনা করা হলোঃ

ফ্রেডরিক উইনস্লো টেলর (Frederic winslow Taylor) [১৮৫৫-১৯১২]

১৮৫৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরে জন্ম নেয়া এ প্রতিভাধর ব্যক্তিই বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার জনক। তিনি তার দীর্ঘ কর্মজীবনে (১৮৭০-১৯১২) সাধারণ শ্রমিক থেকে বড় কারখানার শীর্ষপদ লাভ করেছিলেন। কর্মাবস্থায় তিনি লক্ষ্য করেন যে, শ্রমিক ও ব্যবস্থাপক কেউই একটি নির্দিষ্ট কর্ম দিবসে বাঞ্ছিত কার্যের পরিমাণ সম্পর্কে অবহিত নয়। উৎপাদনের কোন সুশৃংখল পদ্ধতি ছিল না। কাজ সম্পাদনের উত্তম পদ্ধতির জন্য তিনি প্রত্যেক কাজের জন্য সময় নিরীক্ষণ, গতি নিরীক্ষা ও ক্লান্তি নিরীক্ষণ এর উপর জোর দেন। ১৯১১ সালে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Principles of Scientific Management'- এ নিম্নোক্ত চারটি নীতির কথা উল্লেখ করেনঃ

১. প্রত্যেক কার্য সম্পাদনে সনাতনী পদ্ধতির পরিবর্তে বিজ্ঞান ভিত্তিক পদ্ধতির প্রবর্তন;
২. বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শ্রমিক কর্মী নির্বাচন, প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন;
৩. ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিক কর্মীদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি; ও
৪. ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিক-কর্মীদের মধ্যে দায়িত্ব ও কর্তব্যের সুষম বন্টন, যাতে তারা নিজ নিজ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে হবে।

এছাড়াও তিনি পরিকল্পনা প্রণয়নকে নির্বাহী কার্য হতে আলাদা ভাবে দেখান। কার্য সম্পাদনে উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে তিনি শ্রমিকদের জন্য পার্থক্যমূলক মজুরী প্রথার ও প্রবর্তন করেন। তিনি বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার নীতিগুলো যথাযথ ভাবে বাস্ত বায়নের জন্য শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে মানসিক বিপ্লবের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

হেনরী ফেয়ল [Henri Fayol] (১৮৪১-১৯২৫)

হেনরী ফেয়লকে আধুনিক ব্যবস্থাপনার জনক বলা হয়। তিনি মূলতঃ শিল্পপতি ছিলেন এবং ১৮৮৮ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত একটি বৃহৎ কয়লা ও ইস্পাত শিল্পের মহা পরিচালক ছিলেন। তিনি কার্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনা স্কুলের প্রবক্তা হিসেবেও খ্যাত। কেউ কেউ তাকে সার্বজনীনবিদ (Universalist) বলে থাকেন।

১৯১৬ সালে ফরাসী ভাষায় লিখিত বিখ্যাত "General and Industrial Administration"- শীর্ষক গ্রন্থে তিনি ব্যবস্থাপকের ছয়টি কাজের কথা উল্লেখ করেন। যথাঃ

পূর্বানুমান, পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশনা, সমন্বয়সাধন ও নিয়ন্ত্রণ। বস্তুতঃ এটাই ব্যবস্থাপনা কার্যাবলীর সর্বপ্রথম সুশৃঙ্খল ও সুস্পষ্ট সংজ্ঞা ফেয়ল শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ডকে নিম্নোক্ত ছয়টি স্বতন্ত্র অংশে ভাগ করেন।

১. কারিগরী কার্যাবলী (উৎপাদন সংক্রান্ত);
২. বাণিজ্যিক কার্যাবলী (ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত);
৩. আর্থিক কার্যাবলী (মূলধন সংগ্রহ ও এর যথাযথ ব্যবহার);
৪. নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম (সম্পদ ও ব্যক্তির নিরাপত্তা);
৫. হিসাবরক্ষণ (জমা-খরচ, পরিসংখ্যান, মূল) ও
৬. ব্যবস্থাপনা কার্য (পূর্বানুমান, পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশনা, সমন্বয়সাধন ও নিয়ন্ত্রণ)

ফেয়ল মনে করতেন যে ব্যবস্থাপককে ১৪টি নীতি অনুসরণ করতে হয় যা সর্বত্রই প্রয়োগযোগ্য। ফেয়লের এ নীতিগুলো আজও সবচেয়ে গুরুত্বর্পূ মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এ নীতিগুলো সম্পর্কে আমরা এই ইউনিটের চতুর্থ পাঠে বিস্তারিত ভাবে জানব।

হেনরী এল, গ্যান্ট (১৮৬১-১৯১৯) [Henry L. Gantt]

হেনরী এল. গ্যান্ট ছিলেন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। টেলারের সহকর্মী হিসেবে তিনি অনুধাবন করেছিলেন যে ব্যবস্থাপনার যাবতীয় উপাদনের মধ্যে মানসিক উপাদানই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। গ্যান্ট তাঁর আবিস্কৃত গ্যান্ট চার্ট এর জন্য বেশী প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। এটা পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের জন্য খুবই উপযোগী। বর্তমান কালের (PERT) ও (CPM) কৌশলদ্বয়ের পূর্বসূরী হচ্চে এই গ্যান্ট চার্ট।

এছাড়াও ব্যবস্থাপনা শাস্ত্রে তার অন্যান্য অবদান হচ্ছে কাজ ও বোনাস ব্যবস্থার প্রচলন, শ্রমিক প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্বের প্রতি গুরুত্বারোপ ইত্যাদি।

ফ্রাঙ্ক লিলব্রেথ ও লিলিয়ান গিলব্রেথ ঃ (১৮৮৬-১৯২৪((১৮৭৮-১৯৭২)
(Frank and Lillian Gilbreth)

ফ্রাঙ্ক গিলব্রেথ ও তাঁর স্ত্রী লিলিয়ান গিলব্রেথ বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার সময় নিরীক্ষণ ও গতি নিরীক্ষণে অবিস্মরণীয় অবদান রাখেন। ১৯১৫ সালে শিল্প মনোবিজ্ঞানে পি, এইচ, ডি ডিগ্রী প্রাপ্ত লিলিয়ান বিলব্রেথ ছিলেন ব্যবস্থাপনা জগতে সর্বপ্রথম স্বার্থক মহিলা। ফ্রাঙ্ক গিলব্রেথের চিন্তা চেতনা ছিল কার্য সম্পাদনের সর্বোত্তম পদ্ধতি আর লিলিয়ান বিলব্রেথের সাধনা ছিল মানবিক উপাদান সংক্রান্ত।

হুগো মুনস্টারবাগ (Hugo Munsterberg) [১৮৬৩-১৯১৬]

তিনি শিল্প মনোবিজ্ঞানের জনক হিসেবে খ্যাত। তাঁর প্রধান অবদান হচ্ছে ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিকদের ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞান প্রয়োগ।

এলটন মেয়ো [Elton Mayo] (১৮৮০-১৯৪৯)

তিনি মানবিক সম্পর্ক আন্দোলনে সর্বাধিক অবদান রাখেন। তার অবদান হচ্ছে গোষ্ঠী সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ ও কর্মী দক্ষতার ওপর কারখানার পরিবেশ সম্পর্কে গবেষণা।

মেরি পার্কার ফলেট (Mary Parker Follet)

এ মহীয়সি মহিলা ১৯৪১ সালে প্রকাশিত তাঁর (Dynamic Administration) গ্রন্থে ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব, সংঘাত, সংহতি, ও সমন্বয়সাধন ইত্যাদির ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

চেস্টার আই. বার্নাড (Chester I. Barnard) [১৮৮৬-১৯৬১]

তিনি ব্যবস্থাপনার আধুনিক সিসটেম মতবাদের প্রবক্তা। তার অবদান হচ্ছে সংগঠন তত্ত্ব ঃ ব্যবস্থাপনার সমাজতান্ত্রিক দিক যোগাযোগের সমাজতাত্ত্বিক, যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি।

ম্যাক্স উইবার ঃ জার্মান এই মনীষী ব্যবস্থাপনার সামাজিক পদ্ধতি স্কুলের অন্যতম প্রবক্তা।

ডগলাস ম্যাক গ্রেগার ঃ ম্যাকগেগারের x ও y তত্ত্ব ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে একটি বড় অবদান। তাঁর তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

জজ আর টেরি (Jorge R. Terry)

এই বিখ্যাত ব্যবস্থাপনাবিদ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন মতবাদ বা স্কুল সম্পর্কে ধারণা দিন। উপরিউক্ত মনীষীগণ ছাড়াও আরো অনেক মনীষী ব্যবস্থাপনা শাস্ত্রে তাঁদের নিজ নিজ অবদান রাখেন।

সবশেষে বলা যায়, মানব সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নয়নের ধারার সাথে সংগতি রেখে ব্যবস্থাপনা বিষয়ের বিবর্তন বা ক্রমবিকাশ ঘটেছে। এর ফলেই আজ সারা পৃথিবীতে যে কোন প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সর্বপ্রথম ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

পাঠ-সংক্ষেপ
প্রাচীন যুগে (খ্রীষ্ঠের জন্মের পূর্ব হতেই) ব্যবস্থাপনার উৎপত্তি ঘটে।
রোমের ক্যাথলিক গীর্জা প্রথম আনুষ্ঠানিক সংগঠনের স্বীকৃতি পায়।
প্রাচীন গ্রীসে দার্শনিক প্লেটো শ্রম বিভাগ ও বিশেষায়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন।
মধ্য যুগে ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে প্রধান ভূমিকা রাখেন- আল ফারাযী, ইমাম গাজ্জালী, লুকা প্যাসিওলি, থমাস মুর প্রমুখ।
শিল্প বিপ্লবের যুগে ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখেন- জেমস্ স্টুয়ার্ট, এ্যাডাম স্মিথ, রবার্ট ওয়েন, চার্লস ব্যাবেজ, প্রমুখ।
বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার জনক ফ্রেডরিক উইনস্লো টেলর।
হেনরী ফেয়লকে আধুনিক ব্যবস্থাপনার জনক বলা হয়।
হুগো মুনস্টারবার্গ শিল্প মনোবিজ্ঞানের জনক হিসেবে পরিচিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৯.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন-

১. ব্যবস্থাপনার উৎপত্তি ঘটে-
ক. প্রাচীন যুগে খ. খ্রীস্টের জন্মের পরে
গ. মধ্য যুগে ঘ. আধুনিক যুগে

২. প্রথম আনুষ্ঠানিক সংগঠনের স্বীকৃতি পায় কোনটি?
ক. আমেরিকার ক্যাথলিক গীর্জা
খ. রোমের ক্যাথলিক গীর্জা
গ. সীয়ার্স টাওয়ার
ঘ. টুইন টাওয়ার।

৩. শ্রম বিভাগ ও বিশেষায়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন কে?
ক. এরিস্টোটল খ. মার্কাপোলো
গ. থমাস মুর ঘ. প্লেটো

৪. মধ্যযুগীয় ব্যবস্থাপক নন কে?
ক. আল-ফারাজী খ. ইমাম গাজ্জালী
গ. ইমাম মুর ঘ. ইডাম স্মীথ।

৫. শিল্প বিপ্লবের যুগের ব্যবস্থাপক নন কে?
ক. জেম্স স্টুয়ার্ট খ. রবার্ট ওয়েন
গ. চালস ব্যাবেজ ঘ. হেনরী ফেয়ল

৬. বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনায় জনক কে?
ক. হেনরী ফেয়ল খ. জর্জ টেরী
গ. হ্যারল্ড কুঞ্জ ঘ. ফ্রেডরিক টেলর।

৭. আধুনিক ব্যবস্থাপনার জনক কাকে বলা হয়?
ক. স্ট্যানটন খ. কর্ষলার
গ. টেলর ঘ. হেনরী ফেয়ল।

৮. শিল্প মনোবিজ্ঞানের জনক কাকে বলা হয়?
ক. গিলব্রেথ খ. গ্যান্ট
গ. হুগো মুনস্টারবার্গ ঘ. ফেয়ল

৯. ব্যবস্থাপনার আধুনিক সিস্টেম মতবাদের প্রবক্তা কে?
ক. চেস্টার আই বার্নার্ড খ. মেরী পার্কার ফলেট
গ. ডগলাস ম্যাকগ্রেগর ঘ. ম্যাক্স উইবার।

পাঠ ৩ ব্যবস্থাপনার কার্যাবলী ও ব্যবস্থাপনা চক্র

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যবস্থাপনার কার্যাবলী ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ব্যবস্থাপনা চক্র বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

ব্যবস্থাপনার কার্যাবলী

বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন উপায়ে ব্যবস্থাপনা কার্যের বর্ণনা দিয়েছেন। তাদের মতামতের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য দেখা গেলেও মূল বিষয়গুলোর ব্যাপারে তারা সবাই একমত পোষণ করেন। ব্যবস্থাপনার মৌলিক কার্যাবলী হচ্ছে- পরিকল্পনা, সংগঠন, কর্মী সংস্থান, নির্দেশনা ও নেতৃত্ব, প্রেষণা এবং নিয়ন্ত্রণ।

নিম্নে ব্যবস্থাপনার কার্যাবলীসমূহ আলোচনা করা হলঃ

পরিকল্পনা (Planning)

ধরুন, আপনাদের কয়েকজন শিক্ষার্থীদেরকে একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা সফরে পাঠানো হচ্ছে। এক্ষেত্রে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান যাওয়া হবে, কখন, কিভাবে এবং কত সময়ের জন্য যাওয়া হবে তা পূর্বেই নির্ধারণ করতে হবে। আর এটাই হচ্ছে পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা হচ্ছে ব্যবস্থাপনার প্রথম ও প্রধান কাজ। মূলত প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ভবিষ্যতে কে, কখন, কোথায়, কিভাবে এবং কত সময়ের মধ্যে কোন কাজ সম্পন্ন করবে তা পূর্বেই নির্ধারণ করার নামই পরিকল্পনা। প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও নীতি নির্ধারণ, প্রকল্প গ্রহণ, কৌশল, পলিসি ও কর্মসূচী নির্ধারণ, বাজেট প্রণয়ন প্রভৃতি পরিকল্পনা আওতাভুক্ত।

পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান তার অতীত অভিজ্ঞতা, বর্তমান পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং এর সামর্থও দুর্বলতার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন বিকল্পসমূহ হতে সর্বোত্তম বেছে নেয়।

সংগঠন (Organising)

সংগঠন হচ্ছে গৃহীত পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার কৌশল। তাই বলা যায় কোন প্রতিষ্ঠানের পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশাবলী বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় কার্য নির্দিষ্ট করে বিভিন্ন প্রকৃতির কার্যাবলীকে বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করা, অতঃপর কার্য সম্পাদনে বিভাগের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দায়িত্ব কি হবে, তাদেরকে কতটুকু কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা দিতে হবে তা নির্ধারণ করা, অবশেষে যে সব ব্যক্তি, বিভাগ অথবা উপবিভাগ থাকবে তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কি হবে তা নির্ধারণ করাই হচ্ছে সংগঠন। এ সমস্ত কার্যকে যখন কোন কাঠামো বা রূপরেখায় প্রকাশ করা হয় তখন তাকে সংগঠন কাঠামো বলে।

সংগঠনকে মূলত ২ ভাগে ভাগ করা হয়।

১. সরল রৈখিক সংগঠন,

২. উপদেষ্টা সংগঠন।

এ ব্যাপারে ইউনিট ১১তে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

কর্মসংস্থান (Staffing)

ব্যবস্থাপনায় সংগঠন কার্যক্রমের পরবর্তী কার্যক্রম হচ্চে কর্মীসংস্থান। সঠিক কর্মীকে সঠিক স্থানে নিয়োগ করা কর্মী ব্যবস্থাপনার একটি প্রধান বিষয়। কর্মীসংস্থান হচ্ছে সেই পদ্দতি যার মাধ্যমে বিভিন্ন পদে কর্মী নিয়োগ, প্রশিক্ষণ দান, পদোন্নতি প্রদান, অবসর গ্রহণ ইত্যাদিকে বুঝায়।

নির্দেশনা (Directing)

কর্মীসংস্থানের পর ব্যবস্থাপনার অন্যতম কাজ হল সঠিক সময়ে সঠিক কাজ সম্পাদনের জন্য কর্মীদের নির্দেশ প্রদান ও তত্ত্বাবধান করা। নির্দেশনা বলতে কারবারের নিম্ন স্তরের কর্মীদেরকে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জনের সাথে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে তাদেরকে যাবতীয় আদেশ, নির্দেশ, উপদেশ, অনুরোধ, পরামর্শ দান ও তত্ত্বাবধান করাকে বুঝায়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কর্মচারীদের বোধগম্যতার জন্য সহজ সরল ভাষায় নির্দেশনার বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করতে হয়।

প্রেষণা (Motivation)

কর্মীদের মধ্যে কাজের প্রতি আগ্রহ ও উৎসাহ তৈরী করার প্রক্রিয়াকেই প্রেষণা বলে। কর্মচারীদের কর্মক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার

করার লক্ষ্যে তাদের ভেতর উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করা, অনুপ্রাণিত বা প্ররোচিত করা, স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছা, নৈতিকতা, মনোবল ইত্যাদি বৃদ্ধি করার প্রক্রিয়াই হল প্রেষণা।

প্রেষণা সৃষ্টির জন্য ব্যবস্থাপক বিভিন্ন ধরনের আর্থিক ও কল্যাণমূলক কর্মসূচী যেমন, বোনাস, মুনাফা বন্টন, সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণের সুযোগ, বিনোদন ইত্যাদির ব্যবস্থা করে থাকে।

নিয়ন্ত্রণ (Controlling)

নিয়ন্ত্রণ হল ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার সর্বশেষ কাজ। পরিকল্পনা মাফিক প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কার্যাবলী সঠিকভাবে সম্পন্ন হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং কোন ত্রুটি থাকলে তা চিহ্নিত করে সংশোধনের ব্যবস্থা নেয়াই হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ। এ কাজের চারটি বিশেষ ধাপ আছে। যথা-

১. মান নির্ধারণ করা,

২. কাজের ফলাফল পরিমাপ করা।

৩. কার্যফলকে প্রতিষ্ঠিত মানের সাথে তুলনা করা, এবং

৪. মান থেকে কর্মফলের কোন পার্থক্য থাকলে তা সংশোধনের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

উপরে উল্লেখিত প্রত্যেকটা কার্য সম্পর্কে পরবর্তী ইউনিট সমূহে বিষদভাবে আলোচনা করা হবে।

ব্যবস্থাপনা চক্র

সাধারণ 'চক্র' বলতে কোন কিছুর ধারাবাহিক কর্ম প্রক্রিয়াকেই বুঝানো হয়ে থাকে। ব্যবস্থাপনা চক্র বলতে ব্যবস্থাপনা কার্যের চক্রাকারে আবর্তিত হওয়াকে বুঝায়। ব্যবস্থাপনা কার্যাবলী একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া যা ক্রম অনুসারে সম্পাদন করা হয়ে থাকে। এই চক্রের সর্বশেষ কাজ আবার পরবর্তী প্রথম পদক্ষেপের ভিত্তি হিসেবে গণ্য হয়। প্রতিষ্ঠান যতদিন চলে এই চক্রাকার আবর্তন ততদিন অবিরামভাবে পর্যায়ক্রমে চলতে থাকে।

ব্যবস্থাপনা কার্যাবলীর প্রথম কাজ পরিকল্পনা একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বা লক্ষ্য অর্জনের জন্য নেয়া হয়। এর আলোকে সংগঠন প্রতিষ্ঠা, কর্মীসংস্থান, নির্দেশ প্রদান, প্রেষণাদান এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট কাজ শেষে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। নিয়ন্ত্রণ কার্যে বিচ্যুতি নিরুপন ও সংশোধনীমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। নিয়ন্ত্রণ কাজের মাধ্যমে যে পরবর্তী নির্দেশনা বা সুপারিশমালা পাওয়া যায় তার আলোকে আবার নতুন পরিকল্পনা নেয়া হয়।

যদি নিয়ন্ত্রণ কাজে বিচ্যুতি না পাওয়া যায় তাহলেও নিয়ন্ত্রণের পর আবার পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়।

এভাবে প্রতিষ্ঠান যতদিন চলে ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া বা কার্যচক্রও ততদিন স্বাভাবিক নিয়মেই আবর্তিত হতে থাকে।

নিম্নে ব্যবস্থাপনা চক্রটি চিত্রের সাহায্যে প্রদর্শিত হল ঃ

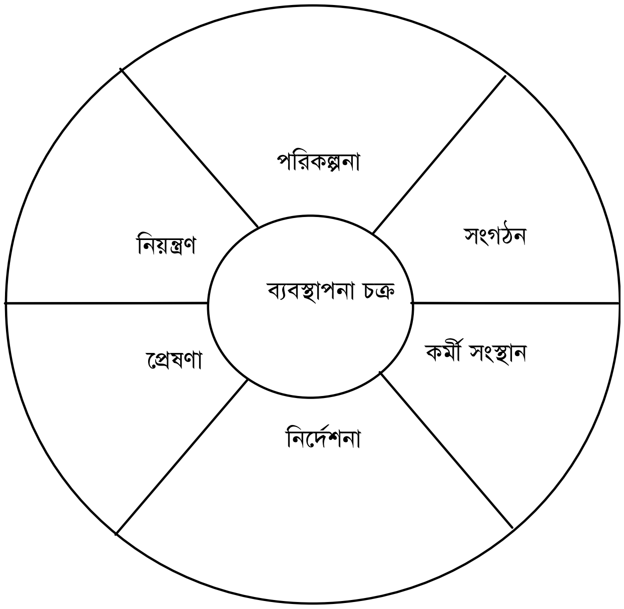

চিত্র ঃ ব্যবস্থাপনা চক্র

পাঠ-সংক্ষেপ

ব্যবস্থাপনা একটি প্রক্রিয়া।
পরিকল্পনা ব্যবস্থাপনা কার্যাবলীর প্রথম এবং প্রধান উপকরণ।
একটা সংগঠন বর্তমানে কি অবস্থানে আছে, এবং ভবিষ্যতে কি করতে চায় তার সেতুবন্ধন পরিকল্পনা তৈরী করে (Planning bridges the gap between where we are & what we want to be)।
সংগঠনকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যায়- সরল রৈখিক (Line) এবং উপদেষ্টা (staff) সংগঠন।
প্রেষণা বলতে বুঝায় প্রাণীর এমন একটি অবস্থা, যা তাকে কোন আচরণ বা কাজে উদ্বুদ্ধ বা চালিত করে। প্রেষণা মানুষের কর্মশক্তি যোগায়।
ব্যবস্থাপনার প্রত্যেকটি কার্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন (Co-ordination), বিদ্যমান যা অত্যাবশ্যক।
নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থাপনার শেষ কাজ। এই অবস্থায় কোন বিচ্যুতি দেখা দিলে (বা না দিলেও) পরবর্তী কাজ অর্থাৎ পরিকল্পনা আরম্ভ হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৯.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন-

১. কোনটি ব্যবস্থানার কাজ নয়?
ক. পরিকল্পনা খ. নির্দেশনা
গ. কর্মীসংস্থান ঘ. কাঁচামাল সরবরাহ করা।

২. সংগঠন প্রধানতঃ কয় প্রকার?
ক. ২ প্রকার খ. চার প্রকার
গ. ৬ প্রকার ঘ. কোন প্রকারভেদ নেই।

৩. ব্যবস্থাপনায় প্রত্যেকটি কাজের মধ্যে বিদ্যমান কোনটি?
ক. পরিকল্পনা খ. নির্দেশনা
গ. সমন্বয় সাধন ঘ. নিয়ন্ত্রণ

৪. নিয়ন্ত্রণ মোট কয়টি ধাপের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়?
ক. ৩টি খ. ৪টি
গ. ৫টি ঘ. ৭টি।

পাঠ ৪ ব্যবস্থাপনার নীতিমালা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যবস্থাপনার নীতিমালা সমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

ব্যবস্থাপনার নীতিমালা (Principles of Management)

ব্যবস্থাপনা নীতিমালা হচ্ছে ব্যবস্থাপকীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভবে সম্পাদনের নির্দেশিকা স্বরূপ। নীতি বা আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে ব্যবস্থাপক তার প্রতিষ্ঠানের যে কোন কার্য সুষ্ঠুভাবে সমাধান করতে পারে।

ব্যবস্থাপনা পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা সব সময় প্রভাবিত হওয়ায় অদ্যবধি এক্ষেত্রে কোন ধরা বাঁধা নিয়ম-নীতি নির্দিষ্ট করা সম্ভব হয়নি। তবে আধুনিক ব্যবস্থাপনার জনক হেনরী ফেয়ল (Henry Fayol) ১৯১৬ সালে ফ্রান্সে তাঁর যুগান্তকারী পুস্তক (General and Industrial Management) এ ১৪টি ব্যবস্থাপনা নীতি প্রদান করেছেন। এ নীতিগুলো অদ্যাবধি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হিসেবে সর্ব মহলেই গ্রহণ করা হয়। নিম্নে এ নীতিগুলো আলোচনা করা হলোঃ

১. কার্যবিভাগ (Division of work)

হেনরী ফেয়ল এ নীতিকে প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় ব্যবস্থাপকীয় ও কারিগরী সংক্রান্ত কার্যাবলীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার কথা বলেছেন। এ নীতি অনুযায়ী প্রত্যেক কর্মীর কাজের আওতা নির্দিষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয় বা জরুরী যাতে দক্ষতা সহকারে শ্রম ব্যবহার করা যায়। এ নীতির ফলে প্রত্যেক কর্মী ও নির্বাহী তাদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে বিশেষায়িত জ্ঞান অর্জন করতে পারে।

২. কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব (Authority and Responsibility)

এই নীতিতে বলা হয়েছে যে, কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব পরস্পর নিবিড় ভাবে সম্পর্কিত। কোন কর্মীকে কার্য সম্পাদন করার জন্য কর্তৃত্ব অর্পন করার সাথে সাথে প্রয়োজনীয় দায়িত্ব ও প্রদান করতে হবে। আবার এরূপ কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের মধ্যে ভারসাম্য থাকা উচিত অন্যথায় কার্যক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়।

৩. শৃঙ্খলা বা নিয়মানুবর্তিতা (Dicipline)

ফেয়লের ভাষায় শৃঙ্খলা হচ্ছে মান্যতা, প্রয়োগ, শক্তি ও শ্রদ্ধার সংমিশ্রণ। প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই শৃঙ্খলা অপরিহার্য। সংক্ষেপে শৃঙ্খলা হচ্ছে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তার অধীনস্থ কর্মচারীদের হতে কি প্রত্যাশা করেন তা সংশ্লিষ্ট সকলকে অবগত করানো কার্য সম্পাদনের জন্য উপযুক্ত তদারকির ব্যবস্থা করা এবং ঐসব কাজ সম্পাদিত না হলে প্রয়োজনীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া।

৪. আদেশের ঐক্য (Unity of Command)

এ নীতির মূল কথা হল, প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক কর্মী শুধুমাত্র একজন উপরওয়ালা বা বস এর অধীনে থাকবে এবং তার আদেশ গ্রহণ করবে। কারণ দুইজন বসের অধীনে একজন কর্মী সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারে না। এক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা এবং সমস্যাই দেখা দেয়।

৫. নির্দেশনার ঐক্য (Unity of Direction)

এ নীতির মূল অর্থ হচ্ছে, সংগঠনের প্রতিটি উদ্দেশ্যের জন্য শুধুমাত্র একজন প্রধান ও একটি মাত্র পরিকল্পনা থাকবে। অর্থাৎ একই উদ্দেশ্য বিশিষ্ট কার্যাবলীর জন্য একটিমাত্র পরিকল্পনা থাকবে এবং ঐ সকল কার্য সম্পাদনের নির্দেশ প্রদান করবেন ও একজন কর্মকর্তা।

৬. সাধারণ স্বার্থের জন্য নিজের স্বার্থ ত্যাগ
(Subordination of individual to general interest)

প্রাতিষ্ঠানিক বৃহৎ স্বার্থকে ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে স্থান দিতে হবে। অধিকন্তু সাংগঠনিক উদ্দেশ্য ও ব্যক্তির উদ্দেশ্যের মধ্যে যাতে

কোন অসংগতি বা সংঘাত না থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে।

৭. পারিশ্রমিক (Remuneration)

সুষ্ঠু ও ন্যায্য বেতন এবং মজুরী কাঠামোর প্রবর্তন করে শ্রমিক-কর্মীদেরকে সর্বাধিক সন্তুষ্টি প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। ফেয়ল বলেন যে, পারিশ্রমিক ন্যায্য হতে হবে এবং এটা প্রদান করার যুক্তিসংগত বা সঠিক পন্থা থাকতে হবে।

৮. কেন্দ্রীকরণ (Centralisation)

প্রতিষ্ঠানের কোন ধরনের সিদ্ধান্ত এর কোন পর্যায়ের ব্যবস্থাপকগণ নিবে সেটা নির্ধারণ করাই হচ্চে কেন্দ্রীকরণের উদ্দেশ্য। সাধারণত প্রতিষ্ঠানে উচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে এবং নিম্নস্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বিকেন্দ্রিভূত থাকে। ফেয়ল বলেন, কর্তৃত্বের কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণের পরিমাণ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দ্বারা নিরুপিত হওয়া উচিত।

৯. জোড়া-মই-শিকল (Scalar Chain)

প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ স্তর থেকে সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত কর্তৃত্ব প্রবাহের একটি শিকল বা চেইন থাকবে। এই শিকল কর্তৃত্বের প্রবাহ ও যোগাযোগের উর্ধ্বগতি বা নিম্নগতি নির্দেশ করে। তবে জরুরী কাজে সংগঠনের নীচু স্তরের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের ব্যবস্থা থাকবে।

জোড়া-মই-শিকল নীতিটি নিম্নে চিত্রের সাহায্যে প্রদর্শন করা হলো ঃ

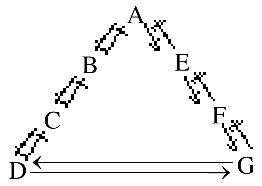

১০. বিন্যাস (Order)

ফেয়ল এ বিন্যাসকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। যথাঃ (ক) মানব বিন্যাস এবং (খ) বস্তুগত বিন্যাস

মানব বিন্যাস হলো প্রত্যেকটি পদে সঠিক ও যোগ্য ব্যক্তির অবস্থান এবং বস্তুগত বিন্যাস হলো যে স্থানে যে বস্তু রাখার উপযুক্ত সে স্থানে সেটিকে রাকা। এ নীতির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রত্যেক কর্মী ও উপাদান যাতে তাদের স্ব-স্ব স্থানে থেকে সুষ্ঠু নিরবচ্ছিন্ন ভাবে কাজ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা।

১১. সাম্যতা (Equity)

এ নীতির মূল কথা হল, কর্মীদের সাথে আচরণ ব্যবস্থাপকদের উচিত সবাইকে সমানভাবে দেখা এবং ন্যায়পরায়ণতা ও স্নেহ প্রদর্শন করা যাতে তাঁরা কর্মচারীদের নিকট হতে আনুগত্য ও কর্তব্যনিষ্ঠ মনোভাব আদায় করতে পারেন।

১২. চাকরির স্থায়িত্ব (Stability of tenure)

অকারণে কর্মীদের ঘনঘন বদলী বা ছাঁটাই করা ব্যবস্থাপনারই অকৃতকার্যতার লক্ষণ এবং খরচ ও বৃদ্ধি পায়। তাই নির্বাহী ও সাধারণ কর্মীবাহিনীর চাকরীকালের স্থিতিশীলতা রক্ষা করে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা ব্যবস্থাপনার অন্যতম নীতি।

১৩. উদ্যোগ (Initiative)

নতুন কোন পদ্দতি বা উপায় উদ্ভাবন ও আবিস্কার করার জন্য কর্মীদেরকে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত ও যথোপযুক্ত সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এতে প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাদের আগ্রহ বাড়ে এবং উন্নত কর্মনৈপুন্য প্রদর্শন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়।

১৪. একতাই বল (Esprit de corps)

যেখানে একতা সেখানেই শক্তি, ব্যবস্থাপককে তার অধীনস্থ কর্মচারীদের টীমওয়াক, একতা ও ভ্রাতৃত্ব বোধে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং এভাবেই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব।

পাঠ-সংক্ষেপ
ব্যবস্থাপনার নীতিমালা প্রবর্তক আধুনিক ব্যবস্থাপনার জনক হেনরী ফেয়ল।
ব্যবস্থাপনার মোট নীতিমালা ১৪টি।
হেনরী ফেয়ল ১৯১৬ সালে ফ্রান্সে তাঁর লেখা পুস্তকে সর্বপ্রথম নীতিমালাগুলো উল্লেখ করেন কিন্তু এগুলো তাঁর জীবদ্দশায় অনুদ্‌ঘাটিত থেকে যায় এবং তাঁর মৃত্যুর পর এগুলো ব্যবস্থাপনার নীতিমালা হিসেবে স্বীকৃতি পায়।
কর্তৃত্ব (Authority) অর্পন করা যায় কিন্তু দায়িত্ব অর্পণ করা যায় না। যিনি কর্তৃত্ব অন্যের নিকট অর্পন করেন তাকেই দায়িত্বের জন্য জবাবদিহি করতে হয়।
আদেশের ঐক্যের মূল কথা হলো প্রত্যেক কর্মী একজন উপরগুলোর অধীনে থাকবে।
নির্দেশনার ঐক্য বলতে বুঝায় একজন প্রধান ব্যক্তি থাকবে এবং শুধুমাত্র তার কাছ থেকেই নির্দেশনা আসবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৯.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন-

১. ব্যবস্থাপনার নীতিমালাগুলোর প্রবর্তক কে?
   ক. হেনরী ফেয়ল খ. টেরী
   গ. টেলর ঘ. কুঞ্জ

২. ব্যবস্থাপনার নীতিমালা মোট কয়টি?
   ক. ৭টি খ. ১০টি
   গ. ১৪টি ঘ. ১১২টি

৩. "একজন প্রধান ও একটি নির্দেশন"- এটি কোন নীতিমালার মূল বক্তব্য?
   ক. কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব খ. শৃঙ্খলা বা নিয়মানু বর্তিতা
   গ. আদেশের ঐক্য ঘ. নির্দেশের ঐক্য

৪. কোনটি ব্যবস্থাপনার নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত নয়?
   ক. কেন্দ্রীকরণ খ. পারিশ্রমিক
   গ. প্রেষণা ঘ. বিন্যাস

৫. হেনরী ফেয়ল কত সালে নীতিমালাগুলো প্রবর্তক করেন?
   ক. ১৯০০ খ. ১৯১০
   গ. ১৯১৬ ঘ. ১৯১৯

রচনামূলক প্রশ্নাবলী

১. ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা দিন।
২. ব্যবস্থাপনার পরিধি বর্ণনা করুন।
৩. ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
৪. ব্যবস্থাপনার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ বর্ণনা করেন।
৫. ব্যবস্থাপনার চক্র বর্ণনা করুন।
৬. ব্যবস্থাপনার নীতিমালাগুলো বর্ণনা করুন।

উত্তরমালা

৯.১ ঃ১.ক ২.খ ৩.ক ৪.খ ৫.খ
৯.২ ঃ১.ক ২.খ ৩.খ ৪.খ ৫.খ ৬.খ ৭.খ ৮.গ ৯.ক
৯.৩ ঃ ১.খ ২.ক ৩.গ ৪.ঘ
৯.৪ ঃ১.ক ২.গ ৩.খ ৪.গ ৫.গ।